ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1502-1508
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.371

শ্রমিক ইতিহাস চর্চায় ঔপনিবেশিক বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনা: প্রসঙ্গ বাংলার নাবিক

ড. আজহারুল মিদ্দা, *স্বাধীন গবেষক, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Spreading labour consciousness throughout the world progressive Marxist thinkers such as Karl Marx, Friedrich Engels and Vladimir Lenin have made significant contributions. In the 20th Century, two eminent historians Eric Hobsbawm and E. P. Thompson have opened new avenues in the exploration of labour history through their examination of the relationship between labour and capital within the context of sociological practice. Historians like Sanat Kumar Bose, Sukomal Sen, Dipesh Chakrabarty, Nirban Basu, Amiya Kumar Bagchi, Subho Basu, Samita Sen and many other scholars have approached the concept of labour consciousness in colonial India from a fresh perspective. The organized movements of workers in Bengal played a crucial role during the colonial period in addressing the imbalance of labour and capital in society and class exploitation. The movements embodied the fight against imperialism and capitalist exploitation, while also fostering the spirit of nationalism. Renowned poets and literary figures in colonial Bengal depicted the exploitation of workers by capitalists through their writings. The writings of poets and writers of the contemporary period played a particularly significant role in transmitting class exploitation and nationalism among the workers. These thoughts of poets and writers on the working life and struggles of sailors in Bengal viewed through the lens of labour consciousness became a part of the fight against imperialist capital exploitation.

Keywords: Colonial, Labour, Bengal, Sailor, Poet, literary, consciousness

বিশ্বের শ্রমিকদের অবস্থান নিয়ে মার্কস[১], এঙ্গেলস[২] এবং লেনিনের[৩] মতো মার্কসীয় প্রগতিশীল চিন্তনগুলি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বিংশ শতকে এরিক হবস্‌বম[৪] এবং ই. পি. থমসন[৫] নামক দুইজন প্রথিতযশা ঐতিহাসিক শ্রমিক ইতিহাস চর্চায় নতুন এক দ্বার উন্মোচন করেছেন। এই ইতিহাস চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ভারতে একদল স্বনামধন্য গবেষক শ্রমিক ইতিহাস চর্চায় বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। এসকল গবেষকদের মধ্যে ছিলেন সনৎ কুমার বসু[৬], সুকোমল সেন[৭], দীপেশ চক্রবর্তী[৮], নির্বাণ বসু[৯], অমিয় কুমার বাগচী[১০], শুভ বসু[১১], শমিতা সেন[১২] প্রমুখ। এই গবেষক ইতিহাসবিদদের দ্বারা ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক ইতিহাস নতুন আঙ্গিকে পরিবেষ্টিত হয়েছে। এখানে ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকদের উপর পুঁজির শোষণ থেকে নিয়ে নারী

শ্রমিকদের শোষণের দিকটিও আলোকপাত করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক সময়কালে শ্রমিকদের অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের এই গবেষণাগুলি শ্রমিক ইতিহাস অনুসন্ধানের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি তৎকালীন সময়ে কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্যকেন্দ্রিক বিভিন্ন লেখনীগুলিতেও শ্রমচেতনা পরিস্ফুট হতে দেখা গিয়েছে। সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখনীর মধ্যে কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, স্মৃতি কথা মূলক গ্রন্থ সহ নানা লেখাতে ঔপনিবেশিক বাংলার শ্রমিকদের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই লেখালেখিগুলিতে বাংলার কৃষি শ্রমিক থেকে নিয়ে বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানার শ্রমিকদের কথা উঠে এসেছে। আবার একইসঙ্গে সাহিত্যকেন্দ্রিক ভাবনায় অনেক লেখাতে বাংলার নাবিক শ্রমিকদেরও প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যা শ্রমিক ইতিহাস চর্চার আর এক অন্যতম খোরাক হিসাবে পরিগণিত। বাংলা হল নদী মাতৃক দেশ এখানে নদনদী, খাল-বিল প্রচুর সংখ্যায় থাকায় এখানকার দৈনন্দিন জীবনে মানুষের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ। বিশেষত পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) অসংখ্য নদ-নদী ও ব-দ্বীপ সমন্বিত জায়গায় মানুষদের জীবনযাত্রা অনেকটাই জলের সাথে সম্পর্কিত ছিল। নদীপথে মাছ ধরা, পণ্য পরিবহণ, যাত্রা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করার ফলে জলপথে এরা অনেকটাই অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে উঠেছিল। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এরা অনেকেই জাহাজী শ্রমিক হিসাবে নিজেদের উপনীত করেছিল। সাহিত্যকেন্দ্রিক অনেক লেখাতেই এই শ্রমিকদের কথা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে যা আমার আলোচনার মূল উপজীব্য বিষয়।

ঐতিহাসিক চেতনায় বাংলার শ্রমিক চর্চা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্য ভাবনা:

ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলার শ্রমিকেরা নানাভাবে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা শোষিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছিল। এই শ্রমিকদের কথা ইতিহাস চর্চার মধ্যদিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হতে দেখা গেছে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় পুঁজি শোষণ বাংলার শ্রমিকদের অবস্থা যে কতটা শোচনীয় করে তুলেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মূলত ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ছায়া ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন হিসাবে রূপায়িত হতে দেখা গিয়েছিল। একইভাবে ঔপনিবেশিক বাংলায় ১৮৫০ সালের পর পাট, কার্পাস, তাঁত, চা-বাগিচা, কয়লা খনি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, লৌহ-ইস্পাত, জাহাজ, বন্দর প্রভৃতি শিল্পগুলি গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। এই গড়ে ওঠা শিল্প কারখানাগুলিতে বাংলার বহু শ্রমিক দলে দলে যোগদান করেছিল। এই শ্রমিকেরা একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক পুঁজি মালিকদের দ্বারা শোষিত হয়েছিল অন্যদিকে এরা দেশীয় মুনাফা লোভী দালালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে বঞ্চনার শিকার হয়েছিল।[১৩] বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই শ্রমিকদের জীবন সংগ্রাম ইতিহাস চেতনায় এক গভীর জায়গা করে নিয়েছে। শ্রমিকদের জীবন সম্পর্কিত এই ইতিহাস চেতনা অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যকেন্দ্রিক ভাবনা থেকে গৃহীত হয়েছে যা শ্রম ইতিহাস চর্চাকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল।

ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে ঐতিহাসিকদের চুলচেরা বিশ্লেষণ শ্রমিক ইতিহাস চর্চার এক নতুন দিক উন্মোচন করে। একইসঙ্গে বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের পর্বগুলি কেমন ছিল তা তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখনীগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলার স্বনামধন্য কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনীগুলিতে শ্রমিকদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যা কেবলমাত্র তাঁদের কল্পনা প্রসূত দিক ছিল না, অনেক ক্ষেত্রেই তৎকালীন সমাজে সাধারণ মানুষ জীবিকার তাগিদে শ্রমিক হিসাবে জীবনধারণের যে প্রতিচ্ছাপ রেখেছে তা বিভিন্ন কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটকে সাহিত্যকেন্দ্রিক ভাবনার দ্বারা ফুটে

উঠেছে। পুঁজি শোষণের সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার অবকাঠামো যেভাবে বাংলার সমাজ জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল তা তৎকালীন সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখনীগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়।

ঔপনিবেশিক বাংলায় চা-বাগিচা শ্রমিকদের অত্যাচারিত হওয়ার বিষয়টি দক্ষিণা চরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫)[১৪] নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' (১৯২৬)[১৫] গল্পে গ্রামের জমিদারের অত্যাচারে গফুর তার একমাত্র মেয়ে আমিনাকে নিয়ে চটকলে কাজের সন্ধানে শহরমুখী হয়েছিল। এখানে এদের চটকলের কাজে শহর অভিমুখী হওয়ার বিষয়টি একদিকে যেমন অত্যাচারী জমিদারের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এক উপায় হিসাবে ধরা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে গফুরের শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার বিষয়টিও খুব একটা সুখকর হয়নি কারণ গল্পে আমিনা অনেকক্ষেত্রে চটকলে কর্মরত শ্রমিকের স্ত্রী ও মহিলাদের মান ইজ্জত হানির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। আবার শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব, ১৯১৮)[১৬] উপন্যাসে জাহাজের খালাসিদের অত্যাচারিত হওয়ার কথা ব্যাক্ত করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখালেখিতে শ্রেণীবৈষম্য, শোষণ এবং সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের ছাপ পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শিল্পী' (১৯৪৩)[১৭] গল্পটিতে মহাযুদ্ধের দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতিতে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকটি তুলে ধরেছেন। এখানে মদন তাঁতি চরিত্রের এক নিষ্ঠাবান তাঁতকর্মীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এই হত দরিদ্র তাঁতি অতিকষ্টে জীবন কাটালেও কখনোও তার শিল্পীসত্ত্বাকে দালাল শ্রেণীর কাছে বিকিয়ে দেয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬)[১৮] উপন্যাসে পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে মাঝিদের দারিদ্রতা ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহের এক চিত্র তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি বাংলার স্বনামধন্য কবিদের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যেও ঔপনিবেশিক বাংলার শ্রমিকদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। নজরুলের 'সাম্যবাদী' (১৯২৫)[১৯] কাব্যগ্রন্থের 'কুলি-মজুর' কবিতাটিতে শ্রমিকদের বাবু শ্রেণীর দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' (১৯৪১)[২০] কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বড় বড় সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেলেও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ মাটি আঁকড়ে তাদের কাজ চালিয়ে যায়। এই শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের শ্রমের দ্বারা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখে, তাদের প্রতিদিনের এই কাজ তাদেরকে সামাজের প্রকৃত নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' (১৮৯৩)[২১] কাব্যগ্রন্থের 'সোনার তরী' কবিতায় বহু মর্মকথা উঠে এসেছে এবং তৎকালীন সময়ে এই কবিতা নিয়ে বহু বিতর্ক হতেও দেখা গিয়েছে। বর্ষায় মেঘ বাদলার দিনে নৌকা নিয়ে কৃষকের কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধান কাটার বিষয়টি সুন্দরভাবে এই কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে। কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকেন্দ্রিক বিভিন্ন লেখালেখিগুলি তৎকালীন সময়কালে মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হত। এখানে লেখালেখিগুলিতে শ্রমিকদের প্রসঙ্গ টেনে কবি-সাহিত্যিকগণ শ্রমিকদের প্রতি এক রাশ ভালোবাসা দেখিয়েছেন। ১৯২০ সালে মুজফ্ফর আহ্মেদকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল ইসলাম 'নবযুগ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নজরুল গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন প্রতিবাদী আন্দোলনে শ্রমিক ও কৃষকদের সামনের সারিতে আনা প্রয়োজন, এই কারণে তিনি নিজ উদ্যোগ নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'লেবার স্বরাজ পার্টি' (১৯২৫) এবং 'বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল' (১৯২৭)। 'নবযুগ' (১৯২০) পত্রিকা প্রকাশ করার পরে কৃষক শ্রমিকদের একত্রিত করার জন্য নজরুল 'লাঙল' (১৯২৫) নামক আরও একটি পত্রিকা বের করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'প্রবাসী' (১৯০১) পত্রিকায় শ্রমিকদের আন্দোলন ও জীবন সংগ্রামের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। ঔপনিবেশিক সময়কালে সামাজব্যবস্থা এবং মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিমূলক প্রসঙ্গ টেনে 'অরণি' (১৯৪১) নামক এক সাময়িক পত্রিকা সত্যেন্দ্রনাথ

মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। মুজফ্ফর আহ্মেদ সম্পাদিত 'গণবাণী' (১৯২৬) পত্রিকাটি কৃষক ও শ্রমিক দলের এক অন্যতম মুখপত্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য চেতনায় বাংলার নাবিক জীবন:

ঔপনিবেশিক বাংলায় উক্ত কবি-সাহিত্যিকদের লেখনীগুলিতে বিভিন্ন ধরণের শ্রমিকদের প্রসঙ্গ উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নাবিকদের কথাও উঠে এসেছে। বাংলার নাবিকেরা যে কলকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজের কাজে নিয়োজিত হয়ে জাহাজী শ্রমিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল এসকল নাবিকদের প্রসঙ্গ নিয়ে কবি ও সাহিত্যিকদের লেখালেখির অন্ত নেই। আবার বাংলায় নদী এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে চলাচলরত বোট, স্টিমার ও স্টিমশিপ জাতীয় তুলনামূলক ছোট অন্তর্বর্তী জলযানগুলিতে অনেক সময় কবি-সাহিত্যিকদের যাত্রা সূত্রে জলপথে নাবিকদের জীবন কেমন ছিল তা প্রত্যক্ষভাবে দেখার প্রতিচ্ছাপ তাঁদের লেখার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার এই কবি-সাহিত্যিকরা নাবিক সম্পর্কিত তাঁদের লেখনীগুলির মাধ্যমে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন কীরূপ ছিল তার চিত্র খুব সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার আত্মজীবনী বা স্মৃতিমূলক গ্রন্থেও বাংলার নাবিকদের কথা উঠে আসে। মুজফ্ফর আহ্মেদ সন্দ্বীপে থাকাকালীন তাঁর বাল্য স্মৃতি কথায় বাংলার নদীকেন্দ্রিক জলযানগুলিতে নাবিকদের অবস্থান গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। চারিপাশে জল দ্বারা পরিবেষ্টিত সন্দ্বীপের অধিবাসীদের সেরূপ কোনো জীবিকা না থাকায় এরা দ্বীপ সাগরে গিয়ে বোট বা নৌকার কাজে যোগ দিয়েছিল। এসকল মানুষদের নিত্যদিন জলপথে যাতায়াত, মৎস শিকার, পণ্য পরিবহণ প্রভৃতি কাজগুলি নদীপথে এদের অনেকটা সাহসী করে তুলেছিল।[২২] এদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে এসকল মানুষদের কলকাতা বন্দর অভিমুখী করে জাহাজী শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের পথ দেখিয়েছিল। রূপদর্শী ছদ্মনামে লেখা 'রূপদর্শীর নক্শা'[২৩] গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় পূর্ব বাংলা থেকে হাজারে হাজারে নাবিক এসে কলকাতা বন্দরে ভিড় জমিয়ে জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল। এই নাবিকেরা কঠিন পরীক্ষার মধ্যদিয়ে সফল হয়ে CDC বা Continues discharge certificate হাতে পেয়েছিল।

বাংলার নাবিকদের নিয়ে কবি-সাহিত্যিকদের লেখালেখিগুলিতে একদিকে যেমন নদী, সমুদ্রের আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক চিত্র বর্ণিত হতে দেখা গেছে তেমনি অন্যদিকে জাহাজের পাটাতনে নাবিকদের অবিরত জীবন সংকুল পরিস্থিতি ও কর্মজীবনের সংগ্রামের দিকটিও ফুটে উঠেছে। অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে' (আষাঢ়, ১৩৪৪)[২৪] ভ্রমণ কাহিনীতে বাংলার নাবিকদের জীবন সম্পর্কে নানা তথ্য উঠে এসেছে। এখানে লেখক, নাবিকরা জলযানগুলিতে কীভাবে কর্মসম্পাদন করত ও জাহাজের প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেওয়া থেকে নিয়ে জলপথে যাত্রাকালের বিভিন্নধরণের খুঁটিনাটি তথ্য এই ভ্রমণ কাহিনীতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। বাংলা ও আসামে প্রবাহিত নদীতে চলাচলরত অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে ভ্রমণকালে লেখক নাবিকদের জীবনধারণ এবং তার সঙ্গে নদীপথ ও নদী ঘাট স্টেশনের (জগন্নাথ ঘাট, গোয়ালন্দ ঘাট, চাঁদপুরি ঘাট, ফুলছড়ি ঘাট প্রভৃতি) নানা তথ্য উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি নদীতে চলাচলরত মিঙ্গিন, গুর্খা, দোয়ারি, মূলতানি প্রভৃতি স্টিমশিপ জলযানগুলির কথাও আমরা লেখকের বর্ণনায় জানতে পারি। এছাড়া নদীপথে অভ্যন্তরীণ জলযানে কর্মরত নাবিকদের সারেঙ, মাস্টার, মেটস্ এবং ড্রাইভার প্রভৃতি উচ্চপদ থেকে নিম্নপদের জায়গাগুলি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করি। ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার নাবিকদের ইউরোপীয় নাবিকদের তুলনায় মাইনে কতটা কম প্রদান করা হত তা এই ভ্রমণ কাহিনীর এক জায়গায় তুলে ধরা হয়েছে। নোয়াখালীর এক সারেঙ যার দীর্ঘ ২৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তার বেতন ছিল ১৮০ টাকা, যেখানে একই দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন ইউরোপীয় নাবিকেরা পেত ৫০০ টাকা।[২৫] অচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্তের 'সারেঙ' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪)[২৬] গল্পে দরিদ্র কৃষক পরিবারের নাসিম নামে এক বালক কিছু খাবারের জন্য দীর্ঘদিন জাহাজের সারেঙ –এর ফাইফরমাশ খেটে পদোন্নতি পেয়েছিল। এখান থেকে বোঝা যায় জাহাজে নাবিকদের পদোন্নতি লাভের প্রক্রিয়াটি খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না, দীর্ঘদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তবেই মিলত উচ্চপদ। বাংলার একজন অন্যতম প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্যিক ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার নদী, বন্দর ও জাহাজকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষ যে জীবিকা নির্বাহ করেছিল তাদের কথা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্য ভাবধারায়। তাঁর 'তিমির-তীর্থ' (১৯৪৪)[২৭] উপন্যাস এবং 'ভাঙা বন্দর' (১৯৪৫)[২৮] গল্পে নদ-নদী, স্টিমার, বন্দর প্রসঙ্গে বাংলার নাবিকদের কথাও উঠে এসেছে। নদী বন্দরকে কেন্দ্র করে জাহাজের আসা-যাওয়া ও বন্দরকে নির্ভর করে বিভিন্ন শিল্পের উদ্ভাবন ঘটে শহর গড়ে ওঠার বিষয়টি 'ভাঙা বন্দর' ছোট গল্পে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এখানে উঠে এসেছে ঝালকাঠি বন্দরটি কীভাবে অবক্ষয় ও ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় ঔপনিবেশিক শোষণ এতটাই চরম পর্যায়ে ছিল যে ঝালকাঠি বন্দর সংলগ্ন তেলমিলগুলি প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল। সৈয়দ মুজতবা আলির 'নোনাজল' (১৯৫৩)[২৯] গল্পে সমীরুদ্দীর জাহাজে দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করে যে অর্থ উপার্জন করেছিল তা তার ছোটভাই কীভাবে অপব্যয় করেছিল সে কথা ভগ্ন হৃদয় নিয়ে এক সারেঙকে শুনিয়েছিল। পাশ্চাত্যে ভ্রমণকালে জাহাজে নাবিকদের বয়লারে আগুনের সামনে কঠোর পরিশ্রমের কথা বিবেকানন্দ তাঁর 'পরিব্রাজক' (মাঘ, ১৩১২)[৩০] ভ্রমণ বৃত্তান্তে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নৌকাডুবি' (১৯০৬)[৩১] উপন্যাসে দেখিয়েছেন রমেশ খালাসিদের কাছ থেকে রান্না করা খাবার এনেছিল বলে তাকে কমলার কাছে ভর্ৎসনার শিকার হতে হয়েছিল। তাঁরই 'ছুটি' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)[৩২] গল্পে জাহাজের খালাসিদের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে খালাসিদের কাছি ফেলে জলের গভীরতা মাপার বিষয়টি অতল গভীরে ফটিকের মৃত্যুকালীন যাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাপান-যাত্রী' (১৯১৯)[৩৩] ভ্রমণ কাহিনীতে জাহাজ সমুদ্রে দুর্যোগ পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে নাবিকদের তৎপরতার সঙ্গে নানা ক্রিয়া-কর্ম করে জাহাজকে সুরক্ষিত রাখার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালানোর বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। এছাড়া 'গোরা' (১৯১০)[৩৪] উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ জাহাজের খালাসিরা কর্মকালে যাত্রীদের সঙ্গে যে খারাপ আচরণ করেছিল সে বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

বাংলা সাহিত্যে আরও বহু কিছু লেখায় বাংলার নাবিকদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হতে দেখা গিয়েছে। এই লেখাগুলির মধ্যে অন্যতম হল রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)[৩৫] গল্প, 'সহযাত্রী' (১৯৩২)[৩৬] কবিতা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্মৃতির রেখা' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)[৩৭], 'অভিযাত্রিক' (১৯৪০)[৩৮], 'হীরামানিক জ্বলে' (১৯৪৬)[৩৯], অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কোট্‌রা' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)[৪০], শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' (১৯১৭)[৪১], জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮)[৪২] কাব্যগ্রন্থের 'নাবিক' এবং 'নাবিকী' কবিতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা' (১৩৯৬ বঙ্গাব্দ)[৪৩] অংশে 'বেনামী বন্দর' ও 'জাহাজের ডাক' কবিতা, শঙ্কু মহারাজের 'গঙ্গাসাগর' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)[৪৪] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সুন্দরবনের চিঠি' (১৩৭০ বঙ্গাব্দ)[৪৫] প্রভৃতি। এই সকল গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও ভ্রমণ কাহিনীতে কবি-সাহিত্যিকেরা নাবিক শ্রমিকদের কর্মজীবন সম্পর্কিত নানা তথ্য তুলে ধরেছেন যা সাহিত্য চেতনায় পরিস্ফুটিত হয়েছে।

উপসংহার:

বাংলার নাবিকদের নিয়ে কবি-সাহিত্যিকদের লেখালেখিগুলি তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় বাংলার নাবিকরা যে এক শ্রেণীর কাছে শোষিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়েছিল তা সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখায় অনেকাংশে উঠে এসেছে। সামাজিক এই অসাম্য বা শ্রেণী বিভাজন যেখানে এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর দ্বারা শোষিত ও

শাসিত, এই মার্কসীয় চেতনা সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার নাবিকেরা এই শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সমাবেশ ও ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই শ্রমিকদের প্রতিবাদ ও অভাব-অভিযোগের বিষয়গুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এদের সামাজিক অবস্থান ও জীবন সংগ্রামের নানাদিকগুলি সাহিত্য সম্বলিত কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই লেখনীগুলি শ্রমিকদের ঔপনিবেশিক পুঁজি শোষণ ও শাসিত হওয়ার দিক সম্পর্কে অনেকটাই সচেতনশীল করে তুলেছিল যা সাহিত্যকেন্দ্রিক ভাবনায় শ্রমিক ইতিহাস চর্চার এক অন্যতম জায়গা রাখে।

তথ্যসূত্র:

১. Marx, Karl. Capital Vol. 1. London, Penguin Books, 1982.

২. Engels, Frierich. Condition of the Working Class in England. Otto Wigand, Leipzing, 1845.

৩. Lenin, V. I. Imperialism. The Highest Stage of Capitalism, Moscow, Foreigen Languages Publishing House, 1917.

৪. Hobsbawam, E. J. Labouring Men: Studies in the history of Labour. New York, Anchor Books, 1964.

৫. Thompson, E. P. The Making of the English Working Class. New Delhi, Penguin Books, 1980.

৬. Bose, Sanat Kumar. Capital and Labour in the Indian Tea Industry. Bombay, All-India Trade Union Congress, 1954.

৭. সেন, সুকোমল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০–২০০০। কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০০৫।

৮. Chakrabarty, Dipesh. Rethinking Working-Class History, Bengal 1890 to 1940. Princeton, Princeton University Press, 2000.

৯. Basu, Nirban. The Working-Class Movement, A Study of Jute Mills of Bengal 1937-47. Calcutta, K.P. Bagchi & Company, 1994.

১০. Bagchi, Amiya Kumar. Capital and Labour Redefined, India and the Third World. Delhi, Tulika Books.

১১. Basu, Subho. Does Class Matter? Colonial Capital and Workers' Resistance in Bengal, 1890 – 1937. New Delhi, Oxford University Press, 2004.

১২. Sen, Samita. Women and Labour in Late Colonial India, The Bengal Jute Industry. Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

১৩. Panikkar, K. N., Byres, Terence J & Patnaik, Utsa (eds.). The Making of History, Essays Presented to Irfan Habib. New Delhi, Tulika Books, 2000, pp. 315-317. ঔপনিবেশিক সময়ে ইউরোপীয় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চপদে স্থলাভিষিক্ত অফিসার বর্গের লোকেরা গ্রামের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য কিছু দেশীয় লোককে নিয়োগ করেছিল এরা 'সর্দার', 'বাবু', 'সাহেব' নামে পরিচিত ছিল। এরা স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রামের সাধারণ নিরীহ লোকেদের কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে শিল্প কারখানায় এনে ঘুষ সহ বিভিন্নপ্রকার মুনাফা গ্রহণ করে এই শ্রমিকদের আর্থিক দিক দিয়ে প্রতারিত করেছিল।

১৪. গোস্বামী, প্রভাতকুমার (সম্পাদিত)। ঊনিশ শতকের দর্পণ-নাটক। চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণা চরণ। চা-কর দর্পণ। কলকাতা, শুকসারী প্রকাশক, ১৯৫৮, পৃ. ১২৯-১৭৫।

১৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। মহেশ। প্রথম বঙ্গবাণী পত্রিকায় ১৯২২ সালে প্রকাশিত।

১৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শ্রীকান্ত ২য় পর্ব। কলকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। শ্রেষ্ঠ গল্প। শিল্পী, ঢাকা, অবসর প্রকাশনা, ১৯৯৮, পৃ. ১২৪-১২৯।
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। পদ্মা নদীর মাঝি। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৩৬।
১৯. ইসলাম, কাজী নজরুল। সাম্যবাদী, কুলি-মজুর। ১৯২৫ সালে প্রথম লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত, পৃ. ৯৪।
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা, ওরা কাজ করে। বিশ্বভারতী, বীরভূম, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮২৯ - ৮৩০।
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সোনার তরী (১৮৯৩), সোনার তরী। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৮৯৩, পৃ. ১৭১।
২২. আহ্‌মেদ, মুজফ্‌ফর। আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৬০, পৃ. ২৩।
২৩. রূপদর্শী, রূপদর্শীর নক্‌শা। মিত্রালয়, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ. ১৭।
২৪. গুপ্ত, অতুলচন্দ্র। নদীপথে। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশকাল ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।
২৫. তদেব, পৃ. ১৩।
২৬. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। সারেঙ। কলকাতা, দিগন্ত পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।
২৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। তিমির-তীর্থ। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।
২৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। ভাঙা বন্দর। কলকাতা, কমলা পাবলিশিং হাউস, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।
২৯. আলী, সৈয়দ মুজতবা ও মজুমদার, রঞ্জন। দ্বন্দ্ব মধুর। আলী, সৈয়দ মুজতবা। নোনাজল। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, প্রকাশকাল শ্রাবণ, ১৩৬০।
৩০. স্বামী বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক। কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন, প্রকাশকাল মাঘ, ১৩১২, পৃ. ৪৬-৪৭।
৩১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। নৌকাডুবি। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯০৬, পৃ. ১০১–১০২।
৩২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ, ছুটি। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০২।
৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জাপান-যাত্রী। বীরভূম, শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৯২৬, পৃ. ১৭।
৩৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গোরা। ঢাকা, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পৃ. ৬৩ - ৬৪।
৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ, রবিবার। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
৩৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পুনশ্চ, সহযাত্রী। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।
৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। স্মৃতির রেখা। কলকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।
৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। অভিযাত্রিক, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। হীরামানিক জ্বলে, কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৪৬।
৪০. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্র রচনাবলী চতুর্থ খন্ড। কোট্‌রা, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
৪১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। চরিত্রহীন। কলকাতা, কামিনী প্রকাশালয়, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।
৪২. দাশ, জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সাতটি তারার তিমির, নাবিক, নাবিকী। কলকাতা, নাভানা, ১৯৫৪।
৪৩. মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা, বেনামী বন্দর, জাহাজের ডাক। কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯।
৪৪. শঙ্কু মহারাজ, গঙ্গাসাগর। অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
৪৫. গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। সুন্দরবনের চিঠি। কলকাতা, বিদ্যালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।